ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের নিজ মুখে কথিত সাধনা বিবরণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। গিরিশ, মাস্টার, বলরাম -- ক্রমে ছোট নরেন, পল্টু, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র মুখুজ্জে ইত্যাদি -- অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিলেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বসিয়া ঠাকুরের দর্শন করিতেছেন। মোহিনীর পরিবারও আসিয়াছেন -- পুত্রশোকে উন্মাদের ন্যায় -- তিনি ও তাঁহার ন্যায় সন্তপ্ত অনেকেই আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যে ঠাকুরের কাছে নিশ্চই শান্তিলাভ হইবে।

আজ ১লা বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, বেলা ৩টা হইবে।

মাস্টার আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভক্তের মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন ও নিজের সাধনা বিবরণ ও নানাবিধ আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মাস্টার আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) -- সে সময় (সাধনার সময়ে) ধ্যানে দেখতে পেতাম, সত্য সত্য একজন কাছে শূল হাতে করে বসে আছে। ভয় দেখাচ্ছে -- যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন না রাখি শূলের বাড়ি আমায় মারবে। ঠিক মন না হলে বুক যাবে।

[*নিত্য-লীলাযোগ -- পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকযোগ*]

“কখনও মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আসত। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেত।

“যখন লীলায় মন নেমে আসত কখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতাম। আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হত -- রামলালাকে (রামের অষ্টধাতু নির্মিত ছোট বিগ্রহ) নিয়ে সর্বদা বেড়াতাম, কখনও খাওয়াতাম। আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ওই রূপ সর্বদা দর্শন হত। আবার কখনও গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন -- পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হত। আবার অবস্থা বদলে গেল! সজনে তুলসী সব এক বোধ হতে লাগল। ঈশ্বরীয় রূপ আর ভাল লাগল না। বললাম, ‘কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে।’ তখন তাদের তলায় রাখলাম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করতে লাগলাম। নিজে দাসীভাবে রইলুম -- পুরুষের দাসী।

“আমি সবরকম সাধন করেছি। সাধনা তিন প্রকার -- সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে বা তাঁর নামটি শুদ্ধ নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাঙ্খা নাই। রাজসিক সাধনে নানারকম প্রক্রিয়া -- এতবার পুরশ্চরণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে; ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে

ইত্যাদি। তামসিক সাধন -- তমোগুণ আশ্রয় করে সাধন। জয় কালী! কি, তুই দেখা দিবিনি! এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না দিস। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই -- যেমন তন্ত্রের সাধন।

“সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অদ্ভুত সব দর্শন হত, আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখলাম। আমার মতো রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করলে! আর ষট্‌পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষট্‌পদ্ম মুদিত হয়েছিল -- টক টক করে রমণ করে আর একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় -- আর ঊর্ধ্বমুখ হয়ে যায়! এইরূপে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠল। আর নিচে মুখ ছিল উর্ধ্বমুখ হল, প্রত্যক্ষ দেখলাম।”

[*ধ্যানযোগ সাধনা -- ‘নিবাত নিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্‌’*]

“সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদীপের শিখা -- যখন হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না -- তার আরোপ করতাম।

“গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখি মারবার জন্য তাগ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই, বাজনা, গাড়ি, ঘোড়া -- কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই। সে জানতে পারলো না যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল।

“একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির হুঁশ নাই। তার হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। সে অনেক দূরে চলে গেছে, এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে, চিৎকার করে পথিককে ডাকছে -- ওহে -- শোনা -- শোনো! পথিক ফিরতে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বলছে, কেন মহাশয়, আবার ডাকছ কেন? তখন সে বললে, তুমি আমায় কি বলছিলে? পথিক বললে, তখন অতবার করে জিজ্ঞাসা করলুম -- আর এখন বলছো কি বললে! সে বললে, তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই নাই।

“ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখা যায় না শোনাও যায় না। স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না -- সাপটাও জানতে পারে না।

“গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না -- যেন বার-বাড়িতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ -- বাহিরে পড়ে থাকবে।

“ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে -- গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না -- বাহিরে পড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হত। প্রতক্ষ দেখলাম -- সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার -- মন তুই কি চাস? মন বললে, ‘না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না।’ মেয়েদের ভিতর-বার সমস্ত দেখতে পেলাম -- যেমন, কাচের ঘরে সমস্ত জিনিস বার থেকে দেখা যায়! তাদের ভিতরে দেখলাম -- নাড়ীভুঁড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ, নাল, প্রস্রাব এই সব!”

[*অষ্টসিদ্ধি ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ -- গুরুগিরি ও বেশ্যাবৃত্তি*]

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঠাকুরের নাম করিয়া ব্যারাম ভাল করিব -- এই কথা মাঝে মাঝে বলিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি) -- যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া -- এই সব। যারা শুদ্ধভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া কিছুই চায় না। হৃদে একদিন বললে 'মামা! মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও।' আমার বালকের স্বভাব -- কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললাম, মা হৃদে বলছে কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অমনি দেখিয়ে দিলে সামনে এসে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসলো -- একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স -- ধামা পোঁদ -- কালাপেড়ে কাপড় পরা -- পড় পড় করে হাগছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা! তখন হৃদেকে গিয়ে বকলাম আর বললাম, তুই কেন আমায় এরূপ কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্যই তো আমার এরূপ হল!

"যাদের একটু সিদ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এই সব হয়। অনেকের ইচ্ছা হয় গুরুগিরি করি -- পাঁচজনে গণে মানে -- শিষ্য-সেবক হয়; লোকে বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময় -- কত লোক আসছে যাচ্ছে -- শিষ্য-সেবক অনেক হয়েছে -- ঘরে জিনিসপত্র থইথই করছে! -- কত জিনিস কত লোক এনে দিচ্ছে -- সে যদি মনে করে -- তার এমন শক্তি হয়েছে যে, কত লোককে খাওয়াতে পারে।

"গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মতো। -- ছার টাকা-কড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা। যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এরূউপ করে রাখা ভাল নয়।[1] একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময় -- এখন তার বেশ হয়েছে -- একখানা ঘরভাড়া নিয়েছে -- ঘুঁটে রে, গোবর রে, তক্তপোশ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদুর, তাকিয়া -- কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে! অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখ ধরে না! আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ির দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে! সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্বনাশ!"

[*শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রলোভন (Temptation) -- ব্রহ্মজ্ঞান ও অভেদবুদ্ধি*]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মুসলমান ধর্ম

"সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপপুরুষ এসে কতরকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণ সুখ নানারকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। বড় গুহ্যকথা। মা দেখা দিলেন, তখন আমি বললাম, মা ওকে কেটে ফেলো। মার সেই রূপ -- সেই ভুবনমোহন রূপ -- মনে পড়ছে। কৃষ্ণময়ীর[2] রূপ! -- কিন্তু চাউনীতে যেন জগৎটা নড়ছে!"

ঠাকুর চুপ করিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন -- "আরও কত কি বলতে দেয় না! -- মুখ যেন কে আটকে দেয়!

---

[1] নাত্মানমবসাদয়েৎ। [গীতা, ৬।৫]

[2] কৃষ্ণময়ী -- বলরামের বালিকা কন্যা

"সজনে তুলসী এক বোধ হত! ভেদ-বুদ্ধি দূর করে দিলেন। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান (মোহম্মদ) সানকি করে ভাত নিয়ে সামনে এল। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধরে রয়েছেন। তিনিই জীবজগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।"

[*ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকভাব ও ভাবাবেশ*]

(গিরিশ, মাস্টার প্রভৃতির প্রতি) -- "আমার বালক স্বভাব। হৃদে বললে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বলো, -- অমনি মাকে বলতে চললাম! এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাকবে তার কথা শুনতে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাকলে অন্ধকার দেখে -- আমারও সেইরূপ হত! হৃদে কাছে না থাকলে প্রাণ যায় যায় হত! ওই দেখো ওই ভাবটা আসছে! -- কথা কইতে কইতে উদ্দীপন হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেশ কাল বোধ চলিয়া যাইতেছে। অতি কষ্টে ভাব সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "এখনও তোমাদের দেখছি, -- কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ, কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এ-সব কিছু মনে নাই।"

ঠাকুর কিয়ৎকাল প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, "জল খাব।" সমাধিভঙ্গের পর মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এই কথা প্রায় বলিয়া থাকেন। গিরিশ নূতন আসিতেছেন, জানেন না তাই জল আনিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর বারণ করিতেছেন আর বলিতেছেন, "না বাপু, এখন খেতে পারব না।" ঠাকুর ও ভক্তগণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) -- হ্যাঁগা, আমার কি অপরাধ হল? এ-সব (গুহ্য) কথা বলা?

মাস্টার কি বলিবেন চুপ করিয়া আছেন। তখন ঠাকুর আবার বলিতেছেন, "না, অপরাধ কেন হবে, আমি লোকের বিশ্বাসের জন্য বলেছি।" কিয়ৎ পরে যেন কত অনুনয় করিয়া বলিতেছেন, "ওদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে?" (অর্থাৎ পূর্ণের সঙ্গে)

মাস্টার (সঙ্কুচিতভাবে) -- আজ্ঞে, এক্ষণই খবর পাঠাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাগ্রহে) -- ওইখানে খুঁটে মিলছে।

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে অন্তরঙ্গ ভক্তদের ভিতর পূর্ণ শেষ ভক্ত, তাঁহার পর প্রায় কেহ নাই?